শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ এবং কিছু প্রাসংগিক ভাবনা

মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

১

শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের কথা প্রথম শুনলাম সম্মিলিত আরব আমিরাত এর শারজাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাংলাদেশী অধ্যাপকের কাছে। স্বল্পকালীন সময়, মাত্র দু'সপ্তাহের জন্য ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে শারজাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম জানুয়ারী মাসের উনত্রিশ তারিখ। ইন্টারনেটের কল্যাণে ৫ই ফেব্রুয়ারীর যে সময়টায় শাহবাগ চত্বরে তরুণ প্রজন্মের সেই অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রায় একই সময়ে আমি সেই বাঙ্গালী অধ্যাপকের পরিবারের সাথে টেলিভিশনের সামনে বসে বিস্ফারিত চোখে সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটি দেখলাম এবং খুবই অবাক হলাম। এও কি সম্ভব? আমার চোখ আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে না তো? আমার প্রায় অর্ধশতাব্দীকালের পরিচিত নিস্তরঙ্গ শাহবাগের মোড়ের এ কোন নব পরিচয়ে উত্তরণ? কোন সে যাদুর কাঠির ছোঁয়ায়, কোন মন্ত্রবলে সে আজ হয়ে গেল তাহরীর স্কোয়ারের জ্ঞাতিভাই - প্রজন্ম চত্বর? কি বিস্ময় সেখানে! আজকের তরুন প্রজন্ম সেখানে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলছে ৭১ এর মানবতা বিরোধীদের ফাঁসির দাবীতে, বলছে 'দাবী শুধু একটাই, রাজাকারের ফাঁসি চাই'। কি শক্তি সে শ্লোগানে; কি গভীর, তুলনাহীন তার ব্যঞ্জনা! যত দেখি, ততই অবাক হই।

আমরা যারা ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তি হিসেবে সেই অসম যুদ্ধের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে জড়িত ছিলাম, কিংবা সেই ভয়াবহ সময়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকা সাধারণ মুক্তিকামী মানুষ, আমরা সবাই দীর্ঘ নয়মাস ধরে অত্যন্ত কাছে থেকে দেখেছি নৃশংসতা কাকে বলে এবং তার ব্যাপ্তি এবং বীভৎসতা কি ভয়ানক এবং তা কত প্রকার হতে পারে। মানবেতিহাসের জঘন্যতম নগ্ন নৃশংসতার অন্যতম ঘটনা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় ব্যাপী বাঙ্গালী নিধন যজ্ঞ এবং আমরা তার ভুক্তভোগী এবং সাক্ষী। যারা এই নারকীয় ঘটনার পরিকল্পনাকারী, রূপকার এবং বাস্তবায়নকারী; যারা এদেশের নিযুত মানুষকে হত্যা করেছে এবং লুণ্ঠন করেছে এদেশের লক্ষ লক্ষ মা-বোনদের সম্ভ্রম; সেই নরাধম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীতো ছিল ভিন্ন জাতের দ্বিপদ বিশিষ্ট জন্তু। এদেশের মানুষকে পদানত রাখার বাসনায় ঔপনিবেশিক সে হার্মাদ শক্তির পক্ষে হয়তো সে নারকীয়তা স্বাভাবিক এবং সম্ভব ছিল; কিন্তু এই বাঙ্গলাদেশে জন্মলাভ করে, এ দেশের আলো-বাতাসে বড় হয়ে, এ দেশের অন্ন-জলে লালিত পালিত হয়ে যে সব বাঙ্গালী সে হানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে তাদের মানবতাবিরোধী অপরাধ বাস্তবায়নে সাহায্য করেছে সেই জামায়াতে ইসলাম এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা এবং তাদের খুনে বাহিনী রাজাকার, আল-বদর এবং আল শামসের সদস্যরা কোন যুক্তিতে তাদের কৃত বীভৎস দুষ্কর্ম এবং অপরাধকে সমর্থন করবে? শত্রুর পক্ষ নিয়ে তারা যে নারকীয় যজ্ঞ চালিয়েছে এদেশের বাবা-মা-ভাই-বোনদের বিরুদ্ধে, তার ন্যায় বিচার হোক (এবং সে বিচারে যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে তাদের মৃত্যুদন্ড হোক), এ আমার প্রজন্মের লোকদের দীর্ঘ দিনের প্রাণের দাবী। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি স্বাধীনতার সেই যুদ্ধে আত্মত্যাগকারী মহান শহীদদের আত্মা এবং সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের ত্যাগের প্রতি সম্মান জানাতে এদের বিচার এবং চরম শাস্তি হওয়ার আর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে গত বিয়াল্লিশ বছর ধরে আমাদের বিশ্বাস তার কোন মূল্য পায় নি। আমাদের দাবী বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে নানা কারণে।

২

বাংলাদেশের কোটি মানুষের এই ন্যায়সংগত দাবী বাস্তবায়নের জন্য ১৯৯১ সালে শহীদ জননী জাহানার ইমাম 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' [ঘাদানিক] গঠন করে এক সংঘবদ্ধ আন্দোলন শুরু করেন। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে এই কমিটি ১৯৯২ সালে 'ঘাতক দালালদের' বিচারের জন্য গণ আদালত গঠন করে এবং এই সব অপরাধীদের 'প্রতীকি বিচারের' আয়োজন করে। কিন্তু তৎকালীন বি এন পি সরকার জাহানারা ইমাম এবং তার ২৩ জন সহযোদ্ধাকে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং এই আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে যায়। দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের তীব্র ক্ষমতালিপ্সা এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের খেলা আর সেই সাথে বি এন পির প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় আনূকুল্যে জামায়েত-শিবিরের এই মানবতাবিরোধী নেতারা বহাল তবিয়তে পুনর্বাসিত হয়। অত্যন্ত অবাক বিস্ময়ে এবং চরম দুঃখ এবং লজ্জার সাথে আমরা লক্ষ্য করি এইসব খুনে নেতারা এদেশের মন্ত্রীত্ব লাভ করে! যে দেশের জন্মকে তারা প্রাণপণে সহিংস ভাবে প্রতিহত করেছে এবং জন্মের পরও যে দেশের অস্তিত্বকেই তারা স্বীকার করেনি এবং তার ক্ষতি করতে চেষ্টা করেছে, সেই দেশেরই লাল-সবুজের পতাকা উড়িয়ে তাদের সরকারী গাড়ী নিঃস্ব,ক্ষুধার্ত এবং পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যঙ্গ করতে করতে হুস করে চলে যায়! আর এ দেশের সাধারণ জনগণ, আমরা শুধু 'কি অন্যায়, কি লজ্জা, কি দুঃখ' বলে দীর্ঘশ্বাস চাপি আর চোখের জল ফেলে 'আল্লাহই এদের অন্যায়ের বিচার করবেন'- আওড়িয়ে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করি। আর তাই আজ, স্বাধীনতা লাভের সুদীর্ঘ বিয়াল্লিশ

বছর পর, ২০১৩ এর ফেব্রুয়ারীতে তরুণ প্রজন্ম যখন এদের মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তির দাবীতে তীব্র শ্লোগানে চরাচর প্রকম্পিত করে মাঠে নামে, যখন তারা তাদের পূর্বসূরীদের খুনীদের বিচারের দাবীতে গণজাগরণ মঞ্চ গঠন করে শাহবাগে আওয়াজ তোলে 'রাজাকারের ফাঁসী চাই/অন্য কোন দাবী নাই' তখন কি এক অব্যক্ত আনন্দ এবং ভালোলাগায় মন ভরে যায়; ওদের সংগে গিয়ে ওদের শ্লোগানে যোগ দিতে ইচ্ছে করে, আরো ইচ্ছে করে বলি 'ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।'

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী নানাবিধ অপরাধের কারণে পলাতক (দেশে অনুপস্থিত)বাচ্চু রাজাকারের ফাঁসির আদেশ হওয়ার পর যখন তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী দুষ্কর্মের হোতা 'মিরপুরের কসাই' নামে কুখ্যাত কাদের মোল্লার ফাঁসির হুকুম হলোনা এবং সেই খুনে রাজাকার আদালত থেকে বের হয়ে জেলের গাড়ীতে ওঠার সময় দুই আঙ্গুল দিয়ে বিজয় সূচক V চিহ্ন দেখানোর মত চরম ধৃষ্টতা দেখালো, তখন যতটা না অবাক হয়েছিলাম, কষ্ট পেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু সেই যে আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে আলেকজান্ডার সেলুকাসকে বলেছিলেন 'বিচিত্র এই দেশ, সেলুকাস!' এতকাল পরে ও সে কথা তেমনি সত্য রয়েছে ! এই বিচিত্র দেশের ততোধিক বিচিত্রতর রাজনীতির গ্যড়াকলে বিচিত্রতম, এবং অনেক সময় হৃদয় বিদারক, সব ঘটনা ঘটে থাকে। এটা সেই দেশ যে দেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী ত্যাগী দেশপ্রেমিক নেতা জনাব তাজউদ্দিন আহমেদকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দেয়া হয়; স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়; জাতীয় চার নেতাকে জেলখানার ভেতরে অত্যন্ত নৃশংস ভাবে খুন করা হয়; পারস্পরিক সন্দেহ, ঘৃণা এবং প্রতিশোধের আবর্তে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী খালেদ মোশাররফ, মেজর হায়দার, কর্নেল তাহের, জিয়াউর রহমানকে প্রাণ দিতে হয়; মুক্তিযুদ্ধের এক বীরসেনানী রাষ্ট্রপতি দেশের শত্রু রাজাকারদের মন্ত্রী বানায়; বিশ্ব-বেহায়া বলে খ্যাত এক সেনাধ্যক্ষ দেশের রাষ্ট্রপতি হয়; নির্বাচন বৈতরনী পার হতে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি বলে পরিচিত দল আওয়ামী লীগ এ দেশের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ধর্মান্ধ এবং ধর্মব্যবসায়ী দল জামায়াতের সাথে গাঁটছড়া বাঁধে এবং সে দলের নেতার শুভাশীষ এবং দোয়া কামনা করে! এই সেই বিচিত্র দেশ যে দেশে ক্ষমতাসীন দলের প্রধান নেতা-নেত্রীরা বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব, দেশের গর্ব প্রফেসর ইউনুসকে অসন্মান করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস পায় এবং পাশের দেশের এক নোবেল পুরষ্কার পাওয়া ব্যক্তিকে নিয়ে নির্লজ্জভাবে লাফালাফি করে আর বিশ্বাস করে স্যান্ডুইচ আর মদ খাইয়ে নোবেল প্রাইজ পাওয়া যায়; মন্ত্রীরা চুরি করেও বহাল তবিয়তে মন্ত্রী পদে বহাল থাকে এবং চরম বেহায়ার মত এখানে ওখানে ন্যায়নীতি ও সততা সম্বন্ধে ভাষণ দিয়ে বেড়ায়; সরকার একজন প্রমাণিত, বিশ্ব স্বীকৃত দূর্নীতিবাজকে রক্ষা করতে দেশের ষোল কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে এবং দেশের উন্নয়নের সিঁড়ি পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বন্ধ হয়ে গেলেও নির্বিকার থাকে এবং দেশবাসীকে আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখায়; দেশের রাষ্ট্রপতি দলীয় স্বার্থ রক্ষায় দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দেয়া মৃত্যুদন্ড রহিত করে বাঁচিয়ে দেন বহুসংখ্যক নৃশংস এবং নিষ্ঠুর খুনীকে; সরকারী নেতাদের কাছের লোক এবং সুহৃদ হওয়ার বরাতে হলমার্ক এবং ডেস্টিনির কর্মকর্তারা হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে পার পেয়ে যায়। এই সেই সব-সম্ভবের বাংলাদেশ যে দেশের এক প্রধান মন্ত্রীর ছেলেরা চুরি করে ধরা পড়ে এবং সে চুরি দেশ এবং বিদেশের আদালতে প্রমাণিত হয়; এক বীর মুক্তিযোদ্ধার সহধর্মিনী এবং দেশের বিরোধী দল প্রধান এদেশের স্বাধীনতার শত্রু, মানবতাবিরোধী অপরাধে অপরাধী জামায়াত-শিবির-রাজাকার-আলবদর-আল শামস নেতাদের বাঁচানোর প্রচেষ্টায় জনস্বার্থ বিরোধী, অযৌক্তিক হরতাল ডেকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটিয়ে মানুষ মারেন এবং বলেন এসব ঘটনায় আরো প্রাণ গেলেও তার প্রয়োজন রয়েছে! এতসব বিষাদী অঘটন ঘটার এই দেশের তরুণ প্রজন্ম যখন কাদের মোল্লার এই অবিশ্বাস্য রায় ঘোষণার পরপরই প্রতিবাদ মূখর হয়ে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে শাহবাগে নেমে আসে তখন সেটাকে যে কোন অভিধায় অভিহিত করা যায় তা নিয়ে সংশয় না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির মানুষের কাছে এটা বিগত ৪২ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শান্তিদায়ক সুবাতাস, হৃদয় উদ্বেলকারী, আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক অসাধারণ বিরল ঘটনা। দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির আরো কোটি মানুষের মত আমিও তাই প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত এবং উদ্বেলিত হয়েছি এবং শাহবাগ থেকে বহুদূরে উষর মরুর দেশ আমিরাতে বসেও ডঃ ইমরান এইচ সরকার, শ্লোগান কন্যা লাকী আখতার, ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দার এবং তার সহগামী বন্ধুদের কর্মকান্ডের সাথে একাত্মতা বোধ করেছি। এই তরুণ প্রজন্মের কল্যাণে প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সময়ের সার্বজনীন শ্লোগান 'জয় বাংলা', যা দূর্ভাগ্যক্রমে একটি রাজনৈতিক দলের শ্লোগান হিসেবে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল, তা যেন আবার স্বমহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলো।

গণজাগরণ মঞ্চ শুরু হবার প্রথম লগ্ন থেকেই এ আন্দোলন সারাদেশে এবং বিদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে এও দেখা গেল যে এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার জন্য ক্ষমতাসীন সরকার দলীয় লোকদের মধ্যে একধরণের হিড়িক পড়ে গেছে। সাধারণ মানুষ দেখতে পেলো সরকারের বিভিন্ন বাক্যবাগীশ নেতারা তাদের 'বাণী' প্রদান করার জন্য মঞ্চের আশেপাশে ঘুরঘুর করছেন। আর এই নেতাদের আশেপাশে আওয়ামী লীগ ঘরানার পোষ্য এবং মার্কামারা পেশাদার আঁতেলদের উপস্থিতিও কারো নজর এড়ালো না। আর সম্ভবতঃ সে কারণেই সরকার বিরোধী দু'একটা কাগজে এই গণজাগরণকে আওয়ামী লীগের ভেল্কিবাজী বলে আখ্যায়িত করতে দেখা গেল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে গণজাগরণ মঞ্চের নেতারা এইসব বাকসর্বস্ব নেতাদের মঞ্চে

উঠতে দিতে নারাজ তখন সাধারণ মানুষ, যারা রাজনীতি এবং রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তাদের কাছে এই আন্দোলনের গ্রহণযোগ্যতা অনেক গুণে বেড়ে গেল। তাদের এই নারাজীর আসল কারণ নিয়ে সাধারণ মানুষ খুব একটা মাথা ঘামায়নি। তবে যেভাবে দিনের পর দিন শাহবাগে সমবেত এই হাজার হাজার মানুষের খাদ্য-পানীয় সরবরাহ করা হয়েছে; যেভাবে তাদেরকে সার্বক্ষনিক নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে; এবং টেলিভিশনের ফুটেজে যাদেরকে প্রায় সর্বক্ষন ডঃ ইমরান সরকারকে ঘিরে রাখতে দেখা গেছে তাতে এ আন্দোলন যে ক্ষমতাসীন মহাজোট দ্বারা প্রভাবিত নয় তা তা প্রমাণ করার জন্য যে এটা প্রয়োজন ছিল এ কথা সম্ভবতঃ অস্বীকার করা যাবে না।

৩

পাঁচই ফেব্রুয়ারী থেকে চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আমি শারজাহতে বসে টেলিভিশনের বাংলাদেশী চ্যানেল এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই গণজাগরণ মন্ত্রের ঘটনাবলী অনুসরণ করছিলাম। মাথায় লাল-সবুজের পতাকার ফেট্টি বাঁধা শিশু, কিশোর, তরুণ বয়সী ছেলে-মেয়েদের সাথে পরিণত বয়সের অজস্র মানুষের ভীড়, তাদের গাওয়া জাগরণী গান এবং কণ্ঠে ধ্বনিত বিভিন্ন শ্লোগানের মাধ্যমে আমি যেন ফিরে গিয়েছিলাম একাত্তরের স্বাধীনতা-পূর্ব উত্তাল দিনগুলোতে। বাঙ্গালীর সেই পুরোনো অথচ চির নতুন শ্লোগান 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' র সাথে এবার উচ্চারিত হচ্ছে এক নতুন শ্লোগান - 'তোমার আমার ঠিকানা, শাহবাগের মোহনা'। যতবারই এই শ্লোগান শুনি, ততবারই এক ভালোলাগায় আচ্ছন্ন হই। তবে এই প্রজন্ম যেহেতু চিন্তা, চেতনা এবং কল্পনা শক্তির মানদন্ডে আমাদের প্রজন্মের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে স্বচ্ছন্দ, এই মন্ত্রের প্রায় সবগুলো গণজাগরণমূলক কর্মকান্ডেই বেশ নুতনত্বের প্রকাশ ঘটেছে। বাঙ্গালী সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে হৃদয়ে ধারণ করে এই প্রজন্ম তাদের প্রাণের দাবী জানিয়েছে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ অহিংস ভাবে। বারোই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় সারাদেশের মানুষ (এবং বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসী বাঙ্গালীরা) দাঁড়িয়ে তিন মিনিট নীরবতা পালন করে শাহবাগের গণজাগরণ মন্ত্রের ঘোষিত উদ্দেশ্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে প্রতিবাদ এবং সংহতি প্রকাশের এক অনন্য নজীর স্থাপন করে।

পনেরোই ফেব্রুয়ারী শারজাহ থেকে এলাম তুরস্কের ইস্তাম্বুল। আমার হোটেলের টেলিভিশনে বাঙ্গলাদেশের কোন চ্যানেল নেই, তাই গণজাগরণ মন্ত্রে কি হচ্ছে তা জানার জন্য একমাত্র Internet ই হল প্রধান ভরসা। ১৬ তারিখ রাতে জানতে পেলাম গণজাগরণ মন্ত্রের সাথে জড়িত ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দারকে কে বা কারা তার বাড়ীর কাছে কুপিয়ে হত্যা করেছে। রাজীব 'থাবা বাবা' নামে ব্লগ লিখতো এবং সে নাকি তার ব্লগে আমদের প্রিয় রসুল হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে অপমান করে কি সব লিখেছে! অতএব, তাকে ইসলাম ধর্মের স্বঘোষিত ঠিকাদার জামায়াত-শিবির আর রাজাকারদের রোষানলে পড়ে প্রাণ হারাতে হলো।

আমার ইস্তাম্বুলে আসার প্রধান কারণ একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে আমার তুর্কী সহযোগী গবেষকের সাথে মতবিনিময় করা। এই সহযোগী গবেষক বন্ধুটির সাথে আমার মিটিং ছিল ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮ তারিখ সকাল ন'টায়। সেদিন বিকেলে বন্ধুটি আমাকে প্রমোদ ভ্রমনে 'বসফোরাস ক্রুজে' নিয়ে গেলেন। সেখানে একজন তুর্কী পলিটিকাল সায়েন্স প্রফেসরের সাথে আমার পরিচয় হলো। তার সাথে আলাপচারিতায় বুঝলাম তিনি বাংলাদেশ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন। কথায় কথায় তিনি আমার কাছে শাহবাগের এই সাম্প্রতিক গণজাগরণ সম্বন্ধে জানতে চাইলে আমি তাকে এই আন্দোলনের স্বঃতস্ফুর্ততা এবং আমাদের জাতীয় দায়মুক্তির জন্য এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা এবং এই দাবীর যথার্থতা ব্যাখ্যা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে একটা পালটা প্রশ্ন করলেন যার জবাব দিতে গিয়ে আমি একটু দ্বিধায় পড়ে গেলাম। তার সাথে আমার কথাবার্তা অনেকটা এরকমঃ

অধ্যাপকঃ *মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য যে ট্রাইবুনাল তোমাদের দেশে বসানো হয়েছে সেটা কি স্বচ্ছ এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন?*

আমিঃ *অবশ্যই সেটা স্বচ্ছ এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন।*

অধ্যাপকঃ *কিন্তু সেটা নিয়ে তো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বেশ সমালোচনা হয়েছে, তাই না?*

আমিঃ *হ্যা, হয়তো হয়েছে, তবে আমাদের দেশের বাস্তবতার নিরিখে সে সমালোচনা মুল্যহীন।*

অধ্যাপকঃ *তোমার দেশ কি তার বন্ধু দেশের মতামতের কোন মুল্য দেয়না?*

আমার মনে পড়লো তুর্কী সরকার প্রধান জনাব আবদুল্লাহ গুল গত ডিসেম্বর মাসে গোলাম আজমকে প্রাণদন্ড না দেয়ার আবেদন জানিয়ে আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান সাহেবকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন যেটা ছিল কুটনৈতিক শিষ্টতা বহির্ভুত একটা ব্যাপার।

আমিঃ *অবশ্যই দেয়; কিন্তু বন্ধু দেশ আমার দেশের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে কেন?*

অধ্যাপকঃ *আচ্ছা, এই অপরাধীদের বিচারের জন্য তোমাদের সরকার যে আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল গঠন করেছেন তা যদি স্বচ্ছই হয় তা হলে তোমরা আসামি পক্ষকে বিদেশী আইনজীবি নিয়োগ করতে দিচ্ছ না কেন?*

আমিঃ *এটা আমাদের বার কাউনসিলের আইনের পরিপন্থি।*

অধ্যাপকঃ *রুয়ান্ডা, যুগোশ্লাভিয়া, বসনিয়া হার্জগোভিনায় কিন্তু বিদেশী আইনজ্ঞ নিয়োগে বাধা দেয়া হয় নি। (একটু থেমে) তোমার দেশ তো আন্তর্জাতিক পরিদর্শকদেরও বিচার কার্য পর্যবেক্ষন করার অনুমতি দিচ্ছে না।*

আমিঃ *আমি এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে অক্ষম।*

অধ্যাপকঃ *আচ্ছা ধরে নিচ্ছি তোমাদের ট্রাইবুনাল স্বচ্ছ এবং পক্ষপাতদুষ্ট নয়। তা'ই যদি হয়, তবে এই ট্রাইবুনালের দেয়া রায় তোমরা মেনে নিচ্ছনা কেন?*

আমিঃ *একজন প্রমাণিত খুনী, যে অনেক নিরপরাধী মানুষকে ঠান্ডা মাথায় খুন করেছে, তার মৃত্যুদন্ড হবেনা এটা সাধারণ জনগণ কেমন করে মেনে নেবে?*

অধ্যাপকঃ *সাধারণ জনগণের বৈরি ভাবাবেগের কারণ না হয় বুঝলাম; কিন্তু তোমার দেশের প্রধানমন্ত্রী কিভাবে জনগণের এই দাবীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বিচারকদের এই ভাবাবেগ আমলে নিয়ে বিচার করার কথা বলেন? এতে কি বিচারের স্বচ্ছতা এবং ট্রাইবুনালের স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে না?*

আমি আইনজ্ঞ নই এবং এ ধরণের একটা ব্যাপারে আমার পক্ষে কথা বলার তেমন কোন যোগ্যতাই নেই। আর তাই আমি এ ব্যাপারে আর কথা বলতে চাইলাম না এবং বসফোরাসের দুই তীরের শোভা দেখতে মনোনিবেশ করলাম। কিন্তু তার প্রশ্নগুলো আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুললো।

হোটেলে ফিরে আমি বেশ সময় নিয়ে ইন্টারনেট ঘেটে এই গণজাগরণ মঞ্চ বিষয়ে আরো বিষদ ভাবে জানার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার এই গবেষণায় আমি যা পেলাম তা আমাকে খুবই আশাহত করলো। দেশী এবং বিদেশী বিভিন্ন সংবাদপত্র, সাময়িকী এবং অন্যান্য সংবাদ সূত্র যথা, ফেসবুক, টুইটার এবং ব্লগ পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে এই মঞ্চটি ঘিরে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীরা যেমন এই মঞ্চকে তারুণ্যের বিজয়, নতুন মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশে শুভ শক্তির উন্মেষ হিসেবে দেখছেন, ঠিক তেমনি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধবাদী, ইসলাম নিয়ে বেসাতকারী, উগ্র পাকিস্তানপন্থী জামায়াত-শিবির এবং তাদের দোসরেরা এটাকে ইসলাম-বিরোধী নাস্তিকদের মঞ্চ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। আমার মনে পড়লো মাত্র ক'দিন আগেই ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দারকে নাস্তিকতার অপবাদ দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং এই বলে শাসানো হয়েছে যে এই আন্দোলনের পক্ষে যারা নিয়মিত ইসলাম বিরোধী ব্লগ লিখছে তাদেরকেও চরম শাস্তি দেয়া হবে। এরা নাকি আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ), আমাদের ধর্মগ্রন্থ আল-কোরআন এবং টুপি-দাড়িওয়ালা লোকদের সম্বন্ধে অবমাননাকর বক্তব্য রাখছে! অপরপক্ষে ব্লগারদের বক্তব্য হচ্ছে তাদের একাউন্টে অনুপ্রবেশ করে জামায়াত শিবিরের ব্লগাররা এসব ইসলাম বিরোধী অশালীন কথা লিখছে। এখানে উল্লেখ্য যে বিভিন্ন সুত্রে পাওয়া তথ্যাবলীর ভিত্তিতে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করে এ ব্যাপারে জামায়াত-শিবিরের কারসাজির অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে এ কথাও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে অনেক ব্লগারই চিন্তা-চেতনায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন 'ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নয়'। সাধারণ মানুষের কাছে এই শ্লোগান ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচায়ক হলেও ধর্মান্ধদের কাছে এটা নাস্তিকতার ঘোষণা। গণজাগরণ মঞ্চের সাথে জড়িত যারা এই শ্লোগান দিয়েছেন তারা ধর্মনিরপেক্ষ না নাস্তিক তা আমার জানা নেই। তবে আমি এমন কিছু ব্লগারের কথা জানি যারা এই মঞ্চের সাথে জড়িত কিন্তু তাদের দাড়ি আছে, তারা নিয়মিত ইসলামী অনুশাসন মেনে চলেন- আল্লাহ, তার নবী, ফেরেশতা, ধর্মগ্রন্থ এবং শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করেন; নামাজ পড়েন; রোজা করেন কোরান তিলাওয়াত করেন; দান-খয়রাত করেন কিন্তু কোন অবস্থাতেই জেহাদী জোশে অন্য ধর্মের মানুষকে হেয় জ্ঞান করেন না বা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করেন না। অবশ্য কট্টর, মৌলবাদী মওদুদীপন্থী জামায়াত-শিবির বা তার অঙ্গদলের কাছে এ উদার বিশ্বাস মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি বিভিন্ন মুসলিম দেশেও এ গণজাগরণ বেশ নেতিবাচক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। শারজাহ এবং ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে আমি লক্ষ্য করেছি যে আরবী ভাষাভাষী বিভিন্ন দেশ এবং সেইসাথে কয়েকটি অনারব মুসলিম দেশের কোন কোন টেলিভিশন চ্যানেল মানবতাবিরোধীদের বিচারের দাবীতে এই আন্দোলন এবং এর নেতাদেরকে ইসলাম বিরোধী হিসেবে তাদের দর্শক-শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছে।

৪

২১শে ফেব্রুয়ারী দুপুরে আমি ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম এবং বাসায় পৌঁছে চা'টা খেয়েই শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে যাব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। অবশ্য বর্তমান 'ডিজিটাল' বাঙ্গলাদেশের রাজধানী ঢাকা-শহরে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় যাওয়া যে কি ঝক্কি তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। মন্দ লোকেরা বলে আমাদের যোগাযোগ মন্ত্রী তার মুখটা একটু কম চালিয়ে যানবাহন বেশী চালানোর ব্যবস্থা করলে ভাল করতেন। এমনিতেই যানজটে ঢাকা মহানগরীর ত্রাহি অবস্থা, এর মাঝে আবার শাহবাগের আশেপাশের প্রধান সড়কগুলি মঞ্চের কারণে পুরো বা অর্ধেক বন্ধ হওয়ায় সে জট আরো দূঃসহভাবে বেড়েছে। আমাকে যেতে হবে উত্তরা থেকে শাহবাগ; ব্যাপারটা যে মোটেও সহজ নয় সেটা বুঝতে কারোই খুব একটা কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু, এমন অবিশ্বাস্য গণজাগরণের ঘটনা তো আর রোজ ঘটে না, সেটাই যাবার ব্যাপারে প্রধানতম অনুপ্রেরণা তা যত কষ্ট আর ঝামেলাই হোক না কেন। আজ যেহেতু

শহীদ দিবস, আজকের মন্ত্রের কার্যক্রম অবশ্যই ভিন্নতর এবং বেশী ভাবগম্ভীর হবার কথা। হল ও তাই। অনুষ্ঠানটি নির্ধারিত সময়ের সামান্য কিছু পরে শুরু হল দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে। এটা অবশ্যই এই আন্দোলনে একটা নতুন সংযোজন; সম্ভবতঃ শাহবাগ চত্বরে সমবেত আন্দোলনকারীরা যে মোটেই নাস্তিক নয় এবং তারা যে নাস্তিকতা সমর্থন করেনা তারই অকাট্য প্রমাণ হিসেবে। আজকে আমি একটা নতুন শ্লোগান শুনলাম 'ধর্ম যার যার/দেশ সবার।' সত্যি তো মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের বিভিন্নতা কেন মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করবে?

জাগরণ মন্ত্রের অন্যান্য সব অনুষ্ঠানের মতো আজকের অনুষ্ঠানেও প্রধান বক্তা ডঃ ইমরান এইচ সরকার। আজকে তার সাথে আরো অনেক বক্তা ছিলেন। শুনলাম তারা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি। তবে বি এন পি সমর্থিত ছাত্রদলের কেউ এখানে ছিল না; বি এন পি এই আন্দোলনের শুরু থেকেই নিজেদেরকে দূরে রেখেছে। তাদের একজন প্রধান নেতা সাদেক হোসেন খোকা, যিনি অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সর্বশেষ মেয়র, এ গণজাগরণ শুরু হবার বেশ কিছুদিন পর এই আন্দোলনকে শর্ত-সাপেক্ষে নৈতিক সমর্থন দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তার শর্ত ছিল মানবতাবিরোধী নেতাদের বিচারের সাথে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপ এবং দুষ্কৃতির ও বিচার ও চাইতে হবে। কিন্তু মন্ত্রের নেতারা তাদের আন্দোলনকে 'রাজনীতিমুক্ত' রাখতে চেয়ে সে দাবী সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছেন। এর পর থেকেই বি এন পি এই মন্ত্রের কুশীলবদেরকে আওয়ামী লীগের ক্রীড়নক এবং এই মন্ত্রকে পাতানো খেলা বলে আখ্যায়িত করে চলেছে। যারা বি এন পির এই অভিযোগের সাথে সহমত পোষণ করেন, নিজেদের অবস্থানের পক্ষে তাদের ও বেশ কিছু জোড়ালো যুক্তি তারা তুলে ধরেন। আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকেই এই গণজাগরণ মন্ত্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রায় নিয়মিতভাবে সর্বজন পরিচিত কিছু আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ এবং বর্তমান মহাজোট সরকারের অঙ্গদলের বিভিন্ন নেতা যেমন বাপ্পাদিত্য বসু, ছাত্রলীগ সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ, যুবলীগ প্রধান মিজানুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জনাব আরেফিন সিদ্দিকী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জনাব আনোয়ার হোসেন, শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক প্রাণ গোপাল ভট্টাচার্য, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট প্রধান জনাব নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার ফোরামের নেতা এবং বর্তমান সরকারদলীয় সাংসদ জেনারেল (অব) কে এম শফিউল্লাহ এবং এ জাতীয় আরো অনেকে নিয়মিত উপস্থিত থাকছেন। তারা আরো বলছেন যে এই মন্ত্রের দৃশ্যমান মুখপাত্র ডঃ ইমরান এইচ সরকার ও নাকি ছাত্রলীগের সাথে সম্পৃক্ত। সত্যি বলতে এই দিনের অনুষ্ঠানমালা চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করা আর সেই সাথে এই প্রজন্ম চত্বরে বেশ কয়েকবার এসেছেন এমন কিছু অরাজনৈতিক সাধারণ মানুষের বিভিন্ন কথাবার্তা শোনার পর দূর প্রবাসে বসে গণজাগরণ মন্ত্রের যে ছবি আমার মনে আঁকা হয়েছিল তার রং বেশ ফিকে হয়ে গেল। শুরুটা সাধারণ মানুষের আশাভঙ্গের বেদনার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ হলেও এ গণজাগরণ মন্ত্র যে এখন সরকারী দল দ্বারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত না হলেও মোটামুটিভাবে প্রভাবিত, এ বিশ্বাস এখন অনেক নির্দলীয় মানুষের মনেও দানা বাঁধতে শুরু করেছে। যে বাচ্চু রাজাকারের মৃত্যুদন্ড হলো, সে পলাতক। কিন্তু বিচারকালে তার মতন একজন ঘৃণ্য অপরাধী রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলো! (তাকে কি পালিয়ে যেতে দেয়া হোল?) তুলনামূলকভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি বড় অপরাধী মৃত্যুদন্ড থেকে বেঁচে গেল এবং প্রকাশ্য রাজপথে হাসিমুখে জনগণকে তার বিজয়ের চিহ্ন দেখালো। (সরকার বদল হলেই আমি ছাড়া পেয়ে যাবো, এটাই কি তার বক্তব্য ছিল?) এসব আলামত বিচার করে দেখলে ষড়যন্ত্র তত্বে বিশ্বাসী তাত্বিকদের ধারণা - 'এটা ইলেকশনকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে জামাত-শিবিরের আঁতাতের ফল'- এ কথা পুরোপুরি অবিশ্বাস করাটা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ যে অতীতে জামাত নেতাদের সাথে প্রাক-নির্বাচনী আঁতাত করার প্রয়াস পেয়েছে সেটাতো খুব বেশি মানুষের অজানা থাকার কথা নয়। 'ডিজিটাল' (!) বাংলাদেশে ইউটিউব না হয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু গুগল সার্চতো এখনো বন্ধ করা হয়নি; সেখানে সার্চ দিলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। যাই হোক, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো আমিও সারা মন প্রাণ দিয়ে নতুন প্রজন্মের এই তরুণদের দাবী 'এই সব মানবতাবিরোধী অপরাধের হোতাদের চরম শাস্তি মৃত্যদন্ড দেওয়া হোক' এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করি এবং ভাবতে চাই যে ষড়যন্ত্র তত্বে বিশ্বাসী তাত্বিকদের ধারণা নিশ্চয়ই সত্য নয়।

বাইশে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, গণজাগরণের আঠারো দিন। আগের রাতে শোনা গিয়েছিল যে আজকের জুমা নামাজের পর বারোটি ইসলাম-পসন্দ দল 'নাস্তিক ব্লগার এবং ইসলাম বিরোধীদের' কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবে। কিন্তু তাদের সেই বিক্ষোভ প্রতিবাদ যে এত ভয়াবহ হবে তা সম্ভবতঃ কারো ধারণায় ছিলনা। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররামে জুমার নামাজ শেষে সালাম ফেরাবার পরপরই মুসল্লী বেশে লুকিয়ে থাকা জামাত-শিবিরের অনুগামীরা মসজিদের ভিতরেই তান্ডবে মেতে ওঠে। তারা জায়নামাজে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং দলবদ্ধভাবে বের হয়ে সাংবাদিকদের উপর আক্রমন চালায়। ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন শহরে তারা 'হেফাজতে ইসলাম' নাম নিয়ে সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়। তারা ঢিল-পাটকেল এবং ককটেল ছোড়ে; বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা পোড়ায়; শহীদ মিনার ধ্বংস করে; গণজাগরণ মন্ত্র, প্রেস ক্লাব এবং সেই সাথে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় এবং বানিজ্যিক স্থাপনায় ব্যাপক ভাংচুর চালায়। এদের প্রতিহত করতে পুলিশ প্রথমে লাঠি-ঢাল এবং পরে পর্যায়ক্রমে কাঁদানে গ্যাস, রাবার বুলেট এবং সবশেষে গুলি ছোঁড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই এতে সারা দেশে বহু লোক হতাহত হয়। দেশবাসী

অবাক হয়ে লক্ষ্য করে যে বি এন পি বেশ দৃঢ় ভাবে এই অপশক্তির অপকর্মের পক্ষ নিয়ে গণজাগরণ মঞ্চ বন্ধ করার দাবী জানায়। ২২শে ফেব্রুয়ারীর পর থেকে দেশের রাজনৈতিক উত্তাপ বেশ দ্রুত বাড়তে থাকে। বিরোধী দল বি এন পি-জামায়াত-শিবির এবং তাদের রাজনৈতিক জোট ঘন ঘন হরতাল ডেকে এবং বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে জনজীবনে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। হঠাৎ করেই নতুন নতুন উগ্র ধর্মীয় সংগঠন যথা 'হেফাজতে ইসলাম' এবং তাদের প্রতিহত করার জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের সমর্থক উলেমা-মাশায়েখরা নতুন দল করে এগিয়ে আসেন।

৫

এসব ঘটনার পরম্পরায় একটা ব্যাপার অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায় যে দেশের জনগণ মোটামুটি তিনটি প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এর প্রথম এবং বৃহত্তম দলটি উদারপন্থী মানুষদের - যাদের মাঝে আছেন পর-মত সহিষ্ণু, নিয়মিত ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা মুসলমান, ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলমান এবং অন্য ধর্মের মানুষ। এই দলে আছে জামায়াত-শিবির-বি এন পি এবং তাদের সমমনা দলগুলির মতাদর্শ বিরোধী আওয়ামী লীগ পন্থী ওলামা- মাশায়েখ; সাধারণ আওয়ামী লীগ কর্মীদের বৃহদাংশ; বি এন পি এর একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ এবং এ দেশের সাধারণ মানুষ। এ দলের অধিকাংশ মানুষই গণজাগরণ মঞ্চের দাবীর প্রতি সহানুভুতিশীল। এরা দেশের ভালো চান, এবং যে দলই সরকার চালাক, তাদের ভালো কাজ সমর্থন করেন এবং মন্দ কাজের প্রতিবাদ জানান। দ্বিতীয় দলটি ইসলামপন্থী যারা ভাবেন এই আন্দোলন ইসলামের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ এবং ভারতের একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং এটাকে যে কোন মূল্যে রুখতে হবে। জামায়াত-শিবির এবং এদের সহযোগী এবং সমমনা কিছু পাকিস্তানপন্থী উগ্র ইসলামী দল, কিছু তথাকথিত পীর, ওলামা, মাশায়েখ এবং বি এন পি অনুসারীদের মধ্যে যারা এ দেশের স্বাধীনতা বিরোধী তারা এই দলে পড়বে। এরা মুসলিম উম্মাহের প্রতি সংহতি প্রকাশকারী এবং গণজাগরণ মঞ্চের ঘোর বিরোধী। তৃতীয় দলটি মোটামুটিভাবে ইসলাম বিরোধী বা ইসলামের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন। এই দলটি অন্য দু'টি দলের চাইতে তুলনামূলক ভাবে ছোট তবে এ দলে উচ্চ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অন্য দু'টি দলের চেয়ে বেশী। এদের মধ্যে রয়েছেন বামপন্থী দলগুলির অনুসারীদের বেশীর ভাগ; আওয়ামী লীগের পোষ্য বেশ কিছু তথাকথিত আঁতেল, বুদ্ধিজীবি ও সংস্কৃতিকর্মী এবং একদল স্বঘোষিত 'মুক্তচিন্তক' এবং 'মুক্তমনের অধিকারী' নাস্তিক। এদের বেশীর ভাগ মোটামুটি ভাবে প্রচন্ড রকম পাকিস্তান বিরোধী, ভারতপন্থী এবং সরকারী দলের প্রচন্ড স্তাবক। এ দলের লোকদের গণজাগরণ মঞ্চের সাথে একাত্মতা ঘোষণায় অগ্রনী ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। এ দলের লোকেদের অধিকাংশই নিজেদেরকে সর্ব-বিদ্যা বিশারদ বলে মনে করেন এবং টেলিভিশন টক-শোতে রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, মানবতা, মানবাধিকার, দর্শন, ধর্ষণ, প্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি তাবৎ বিষয়ে মানুষদেরকে নিয়ত জ্ঞান দিতে পছন্দ করেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি এই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দলটি দেশের মংগলের প্রধান অন্তরায়। বর্তমানে দ্বিতীয় দলটি ঘন ঘন হরতাল দিয়ে,সহিংস বিক্ষোভ এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশের সম্পদ নষ্ট করছে, দেশের অর্থনীতিকে ধীরে ধরে ধ্বংস করছে, মানুষ খুন করছে কিংবা তাদেরকে চিরতরে পংগু করে দিচ্ছে এবং দেশকে চরম নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু এই নৈরাজ্য রোধে এবং দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক সমস্যার সহজ সমাধানে না গিয়ে সরকারী দল চরম ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং গোলাগুলি চালিয়ে মানুষ মারছে। শুধু মার্চ মাসেই ৮২ জন মানুষ মারা গেছেন - স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের বিগত চার দশকে মাত্র একমাসে এত মানুষ মারার কৃতিত্ব (!) আর কোন সরকারের নেই! মজার ব্যাপার হচ্ছে এই তৃতীয় দলটি তাদের নির্লজ্জ স্তাবকতা, এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নীরবতার মাধ্যমে সরকারী কর্মকান্ডকে মোটামুটিভাবে সমর্থন করে চলেছেন। এক সময় যারা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে অত্যন্ত জোড়ালো বক্তব্য রেখেছেন, এখন বি এন পি যখন তত্বাবধায়ক সরকারের দাবী জানাচ্ছে, এই দলের 'জ্ঞানী-গুনীরা' সে দাবীর বিরুদ্ধে আগের চেয়ে জোড়ালো বক্তব্য রাখছেন! গণজাগরণ মঞ্চ কিন্তু এ দলের লোকদের খুব একটা পাত্তা দেয়নি আর সম্ভবতঃ এ জন্যই এ আন্দোলনের প্রথম দিকে তরুণ প্রজন্মের নেতাদের সাথে ছবি তোলার যে প্রতিযোগীতায় তাদেরকে অংশ নিতে দেখা গেছে, বর্তমান সময়ে সেটা আর তেমন প্রকট নয়। দেশের স্বাধীনতা দিবস, ২৫ শে মার্চে যখন টেলিভিশনে ডঃ ইমরান সরকারকে তাদের ছয়দফা দাবী পেশ করতে দেখা গেল, তখন এই ছবি-তোলা আঁতেলদের তেমন কাউকে তার সাথে দেখা যায় নাই।

মধ্য-মার্চ থেকেই গণজাগরণ মঞ্চ নিয়ে সাধারণ মানুষের উৎসাহ বেশ মিইয়ে আসল। এই মঞ্চকে ঘিরে কিছু ঘটমান বিষয় অনেককেই ভাবাতে শুরু করলো। যেমন আন্দোলনের প্রথম দিকে একদিন শোনা গেল শ্লোগান কন্যা লাকী আক্তারকে আঘাত করা হয়েছে এবং আরো শোনা গেল, আঘাতকারী একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের কেউ-কেটা এবং তাকে সনাক্ত করা হয়েছে। একদিন পরেই শোনা গেল যে লাকী আক্তার পানি-শূন্যতায় ভুগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, তবে সাথে সাথে এটা ও শোনা গেল যে রাষ্ট্রের অতি উচ্চ পর্যায়ের কোন নেতার ইংগিতে ব্যাপারটা চেপে যেতে বলা হয়েছে। আর এ ঘটনার দু'একদিন পরেই শাহবাগ মঞ্চের সিসিটিভি মনিটরের কাজে নিয়োজিত পুলিশ অফিসারটির মৃতদেহও আবিস্কৃত হলো। এটাকে কি আদৌ কাকতালীয় ঘটনা বলা যায়? আরো উদাহরণ দেয়া যায়। এই মঞ্চের স্বঘোষিত নেতা ডঃ ইমরান এইচ সরকার কবে মংগল দীপ জ্বালাতে হবে বা দেশ জুড়ে তিন মিনিট নীরবতা পালন করতে হবে জাতীয় কার্যক্রম ঘোষণা করতে পারেন; কিন্তু কবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে সে হুকুম তিনি কোন ক্ষমতা বলে দেন? মানুষের সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে

আবেগের ভূমিকা অপরিসীম, কিন্তু সে আবেগের প্রাবল্য যদি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এবং যৌক্তিক কার্যক্রমকে ব্যহত করে তখন ঝামেলা অবশ্যম্ভাবী। মানুষ ব্যক্তিগত- কিংবা সমষ্টিগতভাবে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিচার চাইতে পারে এবং সে বিচারে অবশ্যই একটি বিশেষ রায় আশা করতে পারে। কিন্তু বিচারক যদি কাংখিত রায় না দেন তবে বিচারপ্রার্থী সে রায়ের বিরুদ্ধে আপিলও করতে পারেন। কিন্তু কাংখিত রায় না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থামাব না - এমন কথা বলতে পারেন কি? যদি বলেন, তবে কি আদালত অবমাননা হচ্ছে না? ২৬শে মার্চ খবরে জানা গেল যে গণজাগরণ মন্ত্রের একটি অংশ 'শহিদ রুমী স্কোয়াড' মূল আন্দোলন থেকে সরে গেছে কারণ ডঃ ইমরান সরকারের দেয়া ৬ দফার সাথে তারা সহমত নয়। তারা জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করার দাবীতে আমরণ অনশন করার ঘোষণা দিল এবং তাদের ৭ জন অনশন শুরু করল। ৩০ মার্চের মধ্যে অনশন কারীদের সংখ্যা দাঁড়ালো উনিশে। এই মন্ত্র কেন ভাগ হলো তার আসল কারণ আমাদের মত সাধারণ মানুষের অজানা, কিন্তু যারা পত্রিকান্তরে প্রকাশিত - ডঃ ইমরান আহমদ সরকার আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট লোক - এই খবরে বিশ্বাস করেন, তারা স্বাভাবিক ভাবেই ধারণা করলেন যে এটা আর অরাজনৈতিক কোন আন্দোলন নয় এবং আওয়ামী লীগ তাদের কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের একটি হাতিয়ার হিসাবে। সে পরিকল্পনাটা কি হতে পারে এটাই এখন বড় প্রশ্ন।

৬

এই নিবন্ধে যাদেরকে আমি দেশের তিনটি দলের প্রথম দল হিসেবে চিহ্নিত করেছি তাদের অনেকের সাথেই আমি কথা বলে দেখেছি যে তারা মনে করেন ক্ষমতাসীন সরকার চায় যে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত দেশ এমন উত্তাল থাকুক যাতে করে মানুষ বি এন পি - জামায়াত এবং তাদের সমমনা দলদের তৈরী নৈরাজ্যের কথাটাই মনে রাখে এবং দেশ চালানোয় বর্তমান সরকারের চরম ব্যর্থতা এবং অন্তহীন অপকীর্তির কথা ভুলে যায়। তবে সেটার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন দেশবাসীর মধ্য বিরাজমান অনৈক্যকে উসকে দিয়ে এমন হানাহানির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যাতে করে দেশ গৃহযুদ্ধের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। তারা আরো মনে করেন আওয়ামী লীগ তাদের সে পরিকল্পনায় মোটামুটি ভাবে সফল হয়েছে। তবে সে সাফল্য তাদেরকে নির্বাচন জেতাবে কিনা সেটা বলা মুশকিল। কারণ বিরোধী দল সম্ভবতঃ ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছে আর আকারে ইংগিতে সেনাবাহিনীকে ক্রান্তিকালে দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষায় তাদের মহান দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে (এবং যথারীতি সরকারী দল ও তাদের আঁতেলদের কঠোর সমালোচনার শিকার হয়েছে)। রব উঠেছে বি এন পি গণতন্ত্র চায়না। দেশের দুই প্রধান দলের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ দেশবাসীকে বিগত ১/১১ এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আবার যে সে ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবেনা সেটা কি কেউ হলফ করে বলতে পারেন? অনেক আঁতেল বোদ্ধাদেরকে প্রায়ই বলতে শুনি 'ভালো সামরিক (বা অন্য কোন অগণতান্ত্রিক) সরকারের চেয়ে মন্দ গণতান্ত্রিক সরকার অনেক ভালো'। আমার পরিচিত খুব কম সাধারণ মানুষকেই আমি একথা বিশ্বাস করতে দেখেছি; তাদের বেশির ভাগ লোক এখনো বিশ্বাস করেন ১/১১ এর সরকার দেশের সাধারণ মানুষের জন্য ভালো ছিল (যদিও তারা এ দেশের দূর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতাদের জন্য মোটেই ভালো ছিল না) ।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে অবশ্যই কিছু ভালো কাজ করেছে যেমন বংগবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করা এবং মানবতাবিরোধীদের বিচার শুরু করা এবং দৃষ্টিনন্দন হাতিরঝিল বানানো। অন্য যে সব কাজে তারা সফল হয়েছে তাতে মানুষের অর্থনৈতিক তেমন কোন উন্নতি হয়েছে কি? যানজট নিরসনে তারা ঢাকা শহরে কয়েকটি ফ্লাইওভার বানিয়েছে এবং বানাচ্ছে (তার ফলে যানজট বাড়িয়েছে এবং আরো বাড়বে বলে অনেক বিশেষজ্ঞের বিশ্বাস), সব ধাতব মুদ্রায় এবং কাগজের টাকায় বংগবন্ধুর ছবি ছাপিয়েছে (এবং বলতে চেয়েছে টাকায় ছাপানো যায় এমন আর কোন নেতার জন্ম এ দেশে হয়নি), ঢাকা বিমান বন্দরের নাম বদলেছেন (এবং এ ব্যাপারে বেহুদা জনগণের টাকা নষ্ট করেছে); চাল, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সব কিছুর দাম বাড়িয়েছে (মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে নির্বাচনের আগে যে সব ওয়াদা করা হয় সেগুলো আসলে কথার কথা, দেশের আভ্যন্তরীন বাজারের পণ্যমুল্য আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে আর তাই দাম বাড়তেই হবে)। এ ধরণের আরো অনেক কাজের উদাহরণই দেয়া যায় যে সব কাজে দেশের আর্থ-সামাজিক কি উন্নতি ঘটেছে তা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজতে হয়। কিন্তু এ সরকারের অপকর্মের ফিরিস্তি গত সোয়া চার বছরের প্রতিদিনের পত্র-পত্রিকা পড়লেই পাওয়া যাবে। বিগত বি এন পি সরকার যে অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল তা এখন আর কারো অজানা নয়। তাদের প্রধান মন্ত্রী, তার পুত্রগণ এবং তাদের সহযোগীদের দূর্নীতি এবং তাদের কুকীর্তির দূর্গ হাওয়া ভবনের ভ্রষ্টাচারের কথা দেশবাসী কখনো ভুলবে না। সেই দূঃশাসনের কাল যেন আর না ফিরে আসে সেই আশায় এদেশের মানুষ ১/১১ উত্তর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হাতে অবিশ্বাস্য বিজয় তুলে দিয়েছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ মানুষের সে আশাকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে। এদেশের মানুষের দুর্ভাগ্য -তুলনামুলক মাপকাঠিতে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সর্বগ্রাসী দুর্নীতির তুলনায় বি এন পির দুর্নীতিকে নস্যি বললেও বাড়িয়ে বলা হয়।

এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে আওয়ামী লীগ বা বি এন পি - চরিত্রগত দিক থেকে এরা মূলতঃ একই ধরণের; একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আওয়ামী লীগ নিজেকে স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি বলে দাবী করলেও তাদের দল রাজাকার মুক্ত নয়। তাদের প্রধান সারির নেতাদের অনেকের সন্তানদেরও নাকি রাজাকারদের সন্তানদের সাথে বিয়ে হয়েছে বলে

জনশ্রুতি আছে। তেমনি বি এন পি জামায়াত-শিবিরকে নিজেদের জোটে টানলেও তাদের দলে প্রচুর মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন। দুই দলেই সৎ মানুষের সংখ্যা খুবই কম; দুই দলই 'কাজ কম কথা বেশী' এবং 'দেশের চেয়ে দল বড় এবং দলের চেয়ে নেতা আরো বড়' তত্বে বিশ্বাসী। প্রতিটি দলের অন্ধ সমর্থকরা তাদের দলের প্রতি অনুগত থাকবেন সেটাই স্বাভাবিক; কিন্তু আমার মত যারা সাধারণ মানুষ তাদের এই দলগুলোর কোনটির প্রতি তেমন কোন দূর্বলতা নেই এবং এ সব দলের নেতা-নেত্রীর প্রতি তেমন কোন শ্রদ্ধাও নেই। ভোট দিতে হয় আর তাই মানুষ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হয় আওয়ামী লীগ না হয় বি এন পি কে ভোট দেয়। তারা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় বি এন পির প্রতি ঘৃণা জানাতে - আওয়ামী লীগকে ভালবেসে নয়; তেমনি তারা বি এন পিকে ভোট দেয় আওয়ামী লীগের প্রতি ঘৃণায়, বি এন পিকে ভালোবেসে নয়। তবে জামায়াতে ইসলাম আর শিবিরের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের তীব্র ঘৃণা রয়েছে; এরা অমানুষের দল - রীতিমত অস্পৃস্য। আর তাই এদের শাস্তি চেয়ে নতুন প্রজন্ম যখন গণজাগরণ মন্ত্র তৈরী করলো তখন সাধারণ মানুষ এবং তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ অনুসারীরা একাত্মতা ঘোষণা করে রাস্তায় নেমে এল। কিন্তু এ প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা যে বর্তমান সরকারের অপশাসন এবং অপকীর্তির বিচার চাইবে না তার নিশ্চয়তা কি? তাই এ মন্ত্র যাতে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ না হতে পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্য একে নিজেদের পক্ষে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা নেয়া সরকারের পক্ষে স্বাভাবিক। গণজাগরণ মন্ত্রের মুল-ধারা থেকে শহীদ রুমী স্কোয়াডের বের হয়ে আসাটাকে যদি কেউ সে অপচেষ্টার প্রতিবাদ বলে ভাবেন তাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যাবে কি?

৭

আমি প্রচন্ডভাবে রাজনীতি সচেতন এবং নিজেকে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তির একজন মানুষ বলে মনে করি। এবং সে ভাবনা থেকেই আমি নতুন প্রজন্মের এই আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছি। Internet এর মাধ্যমে দেখেছি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশীরা একে সমর্থন জানিয়েছে। Facebook এ এই সমর্থকদের মাঝে আমার আত্মীয়-স্বজন এবং প্রিয় বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিক্রিয়াও আমি দেখেছি। কিন্তু ঢাকায়, এই আন্দোলনের খুব কাছাকাছি বসে এ আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি দেখে আমার উচ্ছাস মিইয়ে গেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে যা ঘটছে এবং যেভাবে তা ঘটছে তার ঘোলা আবর্তে পড়ে এ মহা গণজাগরণ নিয়ে অনভিপ্রেত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে যেটা খুবই দুঃখজনক। তবে আমার মতে এ আন্দোলনের প্রধানতম সাফল্য হচ্ছে তরুন প্রজন্মকে ৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারা, তার সত্যিকারের ইতিহাস জানতে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের মাঝে একটি অসাম্প্রদায়িক, সুখী এবং সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় জাগিয়ে তোলা। দলীয় স্বার্থের কাছে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেয়ার যে প্রবণতায় দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল (এবং তাদের জোটভুক্তরা) বর্তমানে ব্যস্ত তারা যদি সে প্রবণতা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে না আসেন, তবে এ প্রজন্ম যে আবার নতুনভাবে এবং দলমত নির্বিশেষে আরো প্রচন্ড, বাধভাঙ্গা শক্তিতে জেগে উঠে তাদেরকে বিপর্যস্ত করবেনা সে রকম ভাবার কোন কারণ নেই। এবারের অভিজ্ঞতা তাদেরকে ভবিষ্যতে আরো সুসংহত আন্দোলন এবং তার মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়তে সাহয্য করবে।

জয় বাংলা! জয় তারুণ্য! জয় নব প্রজন্ম!

ঢাকা; ৩১ মার্চ ২০১৩